জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষকদের যা জানা দরকার

গণসাক্ষরতা অভিযান

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষকদের যা জানা দরকার

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

গণসাক্ষরতা অভিযান

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ : শিক্ষকদের যা জানা দরকার

প্রকাশনায়
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১, ৮১৫৫০৩২
ফ্যাক্স : ৮১১৮৩৪২
ই-মেইল : info@campebd.org
ওয়েবসাইট : www.campebd.org

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১১

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৩৭২০-৭

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ
দিনা অফসেট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৭৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

সহযোগিতায়
সিভিল সোসাইটি এডুকেশন ফান্ড (সিএসইএফ)

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বাণী

'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণ আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি নিরক্ষরমুক্ত দেশ হিসেবে উন্নীত করতে চাই, যেখানে থাকবে না ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, থাকবে না দুর্নীতি। ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, মানব সক্ষমতা উন্নয়নে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন আমাদের আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমাদের সরকার সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে স্বল্পতম সময়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন করেছে। এ শিক্ষানীতিতে 'সবার জন্য শিক্ষা'র সব কয়টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল বয়সের জনগোষ্ঠীর জন্য সমতা ও মানসহ শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রয়েছে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও দূরবর্তী/দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ।

আমাদের বিশ্বাস, এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ উন্নয়ন ও প্রগতিশীল ধারায় নেতৃত্বদানের উপযোগী দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশলী নাগরিক গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। এবারের শিক্ষানীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, আমাদের সময়ে এ নীতি সংসদে অনুমোদিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আমরা শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন মনিটরিং করার জন্য একটি পৃথক কমিটিও গঠন করেছি। আমাদের লক্ষ্য ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা এবং আধুনিক সমাজের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষক সমাজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের উন্নয়নের বিকল্প নেই। আমাদের সরকার শিক্ষকদের উন্নয়নের জন্য নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ (তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা), বেতন কাঠামো পর্যালোচনা এবং শিক্ষা ক্যাডার অন্যতম। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ অন্তর্ভুক্ত এবং শিক্ষকদের জানা দরকার এমন বিষয়গুলো চিহ্নিত করে একটি পুস্তিকা প্রকাশনার যে উদ্যোগ গণসাক্ষরতা অভিযান নিয়েছে আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০: শিক্ষকদের যা জানা দরকার' শীর্ষক অভিযান-এর প্রকাশনাটিতে শিক্ষকদের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার ও মর্যাদার বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই পুস্তিকাটি প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব পালন করে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এ উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের বিশ্বাস, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা যথাসময়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সমর্থ হব এবং বহুবিধ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও একটি নিরক্ষরমুক্ত দেশ ও আলোকিত, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সফল হব।

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি
মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা
৮ জুন ২০১১

মুখবন্ধ

'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ : শিক্ষকদের যা জানা দরকার' শীর্ষক প্রকাশনাটি গণসাক্ষরতা অভিযান-এর একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ। ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় অংশের একটি ব্যবহার উপযোগী সংকলন প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট মহল থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গণসাক্ষরতা অভিযান এ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৭৩ সালের কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও পরবর্তী পরিপ্রেক্ষিত, অগ্রগতি ও নির্বাচিত সরকারের অঙ্গীকার পর্যালোচনা করে ন্যূনতম সময়ে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ এবং সহযোগিতা বিশেষ করে শিক্ষক সংগঠন এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ততা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিক্ষক সংগঠনের বিশেষ ভূমিকা বিবেচনায় রেখে এ প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রকাশনায় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষার স্তরভেদে সুনির্দিষ্ট কৌশল এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে প্রণীত প্রস্তাবনাসমূহের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে শুধু শিক্ষক সমাজই নয়, যে কোনো শিক্ষানুরাগী, আগ্রহী পাঠকও এই প্রকাশনা পাঠে উপকৃত হবেন, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব কাজী ফারুক আহমেদ তাঁর অভিজ্ঞতা ও মননশীলতা প্রয়োগ করে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে শিক্ষানীতির মতো বিশাল একটি বিষয় উপস্থাপনার জন্য অভিযান-এর পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। এছাড়াও তাঁকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন কে. এম. এনামুল হক, মির্জা কামরুন নাহার, মাকসুদা আফরোজ, তাসমিন আক্তার, আবু রেজা, আশুতোষ দেওয়ান, অমিতাভ বিশ্বাস প্রমুখ। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। এ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়ে সিভিল সোসাইটি এডুকেশন ফান্ড আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

আমাদের এ প্রকাশনাটি যদি শিক্ষক সমাজের কাজে আসে, বিশেষ করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, তাহলেই আমাদের এ উদ্যোগ সফল হবে বলে আমরা মনে করি।

রাশেদা কে. চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

ঢাকা
৮ জুন ২০১১

প্রাক-কথন

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার পরে শিক্ষা মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক অধিকার, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে : *(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন*। ৭ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে জাতীয় সংসদে আলোচনা অন্তে সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে ০৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। ২৮ জুন ২০১০ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীকে আহবায়ক করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাসহ মোট ২৮টি অধ্যায় ও ২টি সংযোজনী রয়েছে। এ শিক্ষানীতিতে সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন ও স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রস্তাবসহ বিজ্ঞানশিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃষিশিক্ষা বিষয়ে দিক নির্দেশনা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল এবং কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট থেকে শুরু করে বাংলাদেশে সকল শিক্ষানীতি/শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাবের ধারাবাহিকতার প্রতিফলন রয়েছে। শিক্ষানীতি ২০১০-এ নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি, গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন কাঠামো যুগোপযোগীকরণ এবং তাদের চাকরির নিয়মাবলী তৈরী করে বিধিবদ্ধকরণের মতো বিষয়াবলী গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার স্থাপন বিষয়ক দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষায় সরকারের বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃদ্ধি, বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন গবেষণার সম্প্রসারণ, শিক্ষার সকল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি প্রবর্তন ও শক্তিশালীকরণ,

শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা, কৃষিশিক্ষা সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগীকরণ, চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্প্রসারণের মতো বিষয়গুলো এতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

শিক্ষানীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থাৎ ধর্ম, ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান, আদিবাসীসহ সকল জাতিসত্ত্বা, প্রতিবন্ধী নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষার আওতায় আনতে হবে এবং কাউকেই বাদ দেওয়া যাবে না। শিক্ষা হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষা হবে দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতা বিকাশ এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়ক। শিক্ষানীতি অনুযায়ী মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পেশায় বিভিন্ন পর্যায়ের দক্ষতা সৃষ্টির কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চমানের গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ হবে: বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ হবে : বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা। প্রত্যেক ধারায় এ সকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। নতুন শিক্ষা কাঠামোয় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া আরও যে বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানসম্পন্ন পুস্তক প্রণয়ন, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ, পঠন-পাঠনের জন্য দক্ষ শিক্ষক নিশ্চিতকরণ, সকল শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি যেমন আছে তেমনি তাদের করণীয় সম্পর্কেও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে এবং তার বাইরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবেন, অভিভাবকদের সঙ্গে মিলে শিক্ষার্থীর উন্নয়নে কীভাবে পদক্ষেপ নেবেন তার নির্দেশনা ও পরামর্শ এ শিক্ষানীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এতে মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকতায় আগ্রহী করে তোলার কথা আছে। শিক্ষকদের আত্মপ্রত্যয়ী, কর্মদক্ষ ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক একজন সফল অবদানকারী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রাপ্ত বৈদেশিক বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ শিক্ষকদের দেওয়া হবে। আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হবে এবং কর্ম কমিশনের মাধ্যমে তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে। শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা এবং শিক্ষকতার মান বিবেচনায় আনা হবে। গৃহীত প্রশিক্ষণও শিক্ষার সর্বস্তরে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হবে। পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে

এবং বিধিসম্মতভাবে প্রয়োগ করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে ছুটির সময় ব্যতীত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত করা হবে না। সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অন্যান্যদের মতো অর্জিত ছুটির ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয় সে লক্ষ্যে শিক্ষকের ভূমিকা পালন, আকর্ষণীয়ভাবে পাঠ্যক্রমের বিষয়টি তুলে ধরার কথা সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষার মান-উন্নয়নে তত্ত্ব অপেক্ষা বাস্তব প্রয়োগের দিকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নত জীবন-জীবিকার জন্য দক্ষ, দেশপ্রেমিক, উচ্চ নৈতিকতায় সমৃদ্ধ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, **শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচরের শিকার না হয়**। কার্যত সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা/পাঠদানের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে মেনে নিয়ে শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য হবে মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের মনে সুকুমার বৃত্তির অনুশীলনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি; তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, সহনশীলতা, ধৈর্য, নিজ ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন; কুসংস্কারমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের ব্রত নিয়ে শিক্ষকবৃন্দ মনোযোগ সহকারে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করবেন। অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সম্মিলিত উদ্যোগে শিক্ষকগণ কাজ করবেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কর্মদল গঠন করা হবে। বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, বাংলা ভাষা শুদ্ধ ও ভালোভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়, তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, সব ধরনের প্রতিবন্ধী যাতে একই মানের শিক্ষা পেতে পারে সে লক্ষ্যে শিক্ষকগণ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা, দেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশে শিক্ষকগণ যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন।

শিক্ষানীতি ২০১০-এর পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন বাংলাদেশে শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষানীতিতে যে ৩০টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে ১৭টি প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটি শিক্ষকদের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও প্রণোদিত করেই অর্জন করতে হবে। শিক্ষকরা মূল শিক্ষানীতিটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে গঠনমূলক ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের এ পুস্তিকায় শিক্ষানীতির পুরোটা তুলে না দিয়ে প্রধান প্রধান বিষয়গুলো প্রয়োজনমতো তুলে ধরা হয়েছে, যা শিক্ষকদের বিশেষ সহায়ক হবে।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ০১
২. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ০১
৩. বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল ০৪
৩.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ০৪
৩.২ প্রাথমিক শিক্ষা ০৪
৩.৩ মাধ্যমিক শিক্ষা ০৫
৩.৪ বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ০৭
৩.৫ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ০৮
৩.৬ মাদ্‌রাসা শিক্ষা ০৯
৩.৭ ক্রীড়াশিক্ষা ১০
৩.৮ নারীশিক্ষা ১০
৩.৯ বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট, গার্লগাইড এবং ব্রতচারী ১১
৩.৯.১ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ১১
৩.৯.২ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা ১২
৩.৯.৩ স্কাউট, গার্লগাইড ও বিএনসিসি ১৩
৩.৯.৪ ব্রতচারী ১৩
৩.১০ অন্যান্য ১৩
৩.১০.১ ঝরে পড়া সমস্যা নিরসনে করণীয় ১৩
৩.১০.২ গ্রন্থাগার ১৪
৪. শিক্ষা প্রশাসন ১৫
৪.১ শিক্ষা প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ১৫
৪.২ শিক্ষার স্তরভিত্তিক কতিপয় কৌশল ১৬
৪.২.১ প্রাথমিক শিক্ষা ১৬
৪.২.২ মাধ্যমিক শিক্ষা ১৬
৪.৩ শিক্ষার মানোন্নয়নে জনসম্পৃক্ততা ১৭
৫. শিক্ষকদের দায়িত্ব কর্তব্য মর্যাদা ও অধিকার ১৮
৬. শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে কয়েকটি প্রস্তাব ২৩

১. ভূমিকা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মানসম্মত আধুনিক ও যুগোপযোগী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ভাষা, গণিত, ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চাসহ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাক্রম, শিক্ষা প্রশাসন এবং জনসম্পৃক্ততার একটি কার্যকর মিথস্ক্রিয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে জাতীয় শিক্ষানীতি।

২. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্মত শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন : ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক, চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্মত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণী বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্মত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১. বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯. সর্বক্ষেত্রে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাচর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭. বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০. মাদক জাতীয় নেশাদ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

৩. বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল

৩.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি।

ভর্তির বয়স

৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তী কালে তা ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।

শিক্ষাক্রম ও কৌশল

১. শিক্ষাক্রম হবে শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক, সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন, অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়ক।

২. শিক্ষক শিক্ষাদানের সময় অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরনের সহজ আর্কষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন।

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করা হবে।

৪. সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞানসহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

৩.২ প্রাথমিক শিক্ষা

দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে গড়ে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক, মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থা নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ভর্তির বয়স

বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

শিক্ষাক্রম ও কৌশল

১. দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

৩. প্রথম শ্রেণী থেকে সহশিক্ষাক্রম বিষয় থাকতে পারে। প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

৪. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের কাছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলে সেদিকে নজর দেওয়া হবে এবং শিক্ষা পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক, পাঠদানে আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক।

৫. শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলগতভাবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১. স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। সকল শ্রেণীতে কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। খেলাধুলা ও শরীরচর্চার দক্ষতা ধারাবাহিক মূল্যায়নে স্থান পাবে।

২. পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৩. অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত এই পরীক্ষার নাম হবে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। সকল পরীক্ষায় মুখস্থকে নিরুৎসাহিত করা এবং সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভাগভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৪. যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর আন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল জন্ম তারিখসহ উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৩.৩ মাধ্যমিক শিক্ষা

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার

মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য-অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশিদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষাক্রম ও কৌশল

১. শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০-এ উন্নীত করা হবে।

২. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সকল ধারাতেই কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা-বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে।

৩. কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা হবে।

৪. অ্যাকাডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে, যেন প্রতিটি বিদ্যালয় প্রতি মাসে অন্তত একবার বিস্তারিতভাবে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১. দশম শ্রেণী শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC) পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে।

২. দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (HSC) পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৩. মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে সে বিষয়ে/বিষয় দু'টিতে দু'বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

৫. ধারাবাহিক মূল্যায়ন, হোমওয়ার্ক, মিড-টার্ম পরীক্ষায় আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৬. প্রান্তিক ও পাবলিক পরীক্ষাসমূহের তারিখ অ্যাকাডেমিক বছর শুরু হওয়ার আগেই নির্ধারণ করা হবে এবং তা অনুসরণ করা হবে।

৭. গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং প্রভৃতির ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষার মান অর্জন বিঘ্নিত হচ্ছে। এর অপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন করা হবে।

৮. পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপকদের আরো উদ্যোগী হতে হবে। এই বিষয়ে সময় সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করা হবে।

৩.৪ বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা ও অনমনীয়তা এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের কারণে দেশে বিরাজমান নিরক্ষরতা ব্যাপক। নিরক্ষরতা সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষাবিষয়কে ভিত্তি করে বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে কার্যকর গণশিক্ষার বিস্তার তাই জরুরি। বয়স্ক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে সাক্ষরতা শিক্ষা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, সচেতনতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।

শিক্ষাক্রম ও কৌশল

বয়স্ক শিক্ষা

১. দেশের সকল নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তবে নিরক্ষরদের মধ্যে যাদের বয়স পনের থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর তারা এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

২. বয়স্ক শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স ব্যতীত অন্যান্য কোর্সের সময়সীমা, বিষয়বস্তু, পঠন-পাঠনের পদ্ধতি, শিক্ষকের যোগ্যতা ও শিক্ষণ-প্রক্রিয়া, স্থানীয় ও প্রবাসী জনমানুষের চাহিদা, সম্পদের প্রাপ্যতা ও পেশাগোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হবে।

৩. অর্জিত শিক্ষা ও দক্ষতাকে অটুট রাখার জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৪. সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকরণ, প্রক্রিয়া ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটিয়ে যথাসম্ভব কম সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষতা দূর করার চেষ্টা করা হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি **মূল্যায়ন কমিটি** গঠন করা হবে।

৫. স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে ছুটির সময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।

৬. সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনায় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট বছর থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ প্রণীত হবে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় এমন উপকরণ দ্বারাই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে।

৩. বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা হবে। দেশের অনগ্রসর এলাকা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই শিক্ষাক্রমের আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে।

৩.৫ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

শিক্ষাক্রম ও কৌশল

১. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:১২।

২. প্রাথমিক স্তরের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে।

৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল শিক্ষাক্রমে যথাযথ দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪. ১৯৬২ সালের শিক্ষানবিসি আইনকে যুগোপযোগী করে দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষানবিস (অ্যাপ্রেনটিসশিপ) কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হবে।

৫. প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

৬. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত মানসম্মত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত রাখা হবে।

২. প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে। অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর যেন ধাপে ধাপে নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

৩. অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর যারা কোনো মূলধারায় পড়বে না তারা ছয় মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জাতীয় দক্ষতামান-১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী সমাপ্ত করে একজন যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৪. এস.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এবং জাতীয় দক্ষতামান-৪ এর সনদধারীরা ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য ডিপ্লোমা/বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (একাদশ-দ্বাদশ)/ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স (একাদশ-দ্বাদশ)/সমমানের কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৫. কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা যাচাই করে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

৩.৬ মাদ্‌রাসা শিক্ষা

মাদ্‌রাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী অনুধাবনের পাশাপাশি জীবনধারণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয় ও উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষাক্রম ও কৌশল

১. শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়িসহ সব ধরনের মাদ্‌রাসাসমূহ আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

২. অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ি পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, গণিত, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে।

৩. সাধারণ শিক্ষার মতো মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠদান করা হবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১. মাদ্‌রাসার ক্ষেত্রে জুনিয়র দাখিল, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সকল ধারার জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহে অন্যান্য ধারার সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নপত্র অনুসরণ করা হবে।

২. সকল স্তরে সুচারুরূপে পরিচালনা ও তদারকির জন্য সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিতরূপে পরিবীক্ষণ ও অ্যাকাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.৭ ক্রীড়াশিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণ-তরুণীদের পূর্ণ বিকাশে শরীরচর্চা ও ক্রীড়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীলতা, সৃজনধর্মিতা এবং আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুস্থ দেহ ও মনের সমন্বয় মানব উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়াশিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

১. ক্রীড়াশিক্ষাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিস্তৃতির জন্য প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে একটি করে ক্রীড়াশিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

২. ক্রীড়াশিক্ষা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ফলে যাতে সাধারণ ধারার উচ্চাশিক্ষায় অধ্যয়নের পথ রুদ্ধ না হয় সে জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অভিন্ন বিষয়গুলো ক্রীড়াশিক্ষার জন্যও বাধ্যতামূলক হবে।

৩. দেশের সকল ক্রীড়াশিক্ষা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষা যে কোনো একটি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হবে।

৪. ক্রীড়াশিক্ষার বিস্তার এবং এ শিক্ষা জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান, আন্ত স্কুল-কলেজ এবং জাতীয় পর্যায়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

৩.৮ নারীশিক্ষা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীশিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় উন্নয়নে নারীকে নিষ্ক্রিয় রাখার বিরাজমান প্রবণতা দূর করা হবে। সার্বিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে।

১. মেয়ে শিশুরা যাতে বিদ্যালয় থেকে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সময় যাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেজন্য তাদের শিক্ষার সুবিধার্থে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধা ও প্রয়োজনে নিরাপদ ছাত্রীনিবাসের ব্যবস্থা করা হবে।

২. ঝরে পড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না তাদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান

অধিকারের কথা তুলে ধরা হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

৪. যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরসন এবং নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় নারী যাতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন তার উপযোগী করে নারীকে গড়ে তোলা।

৫. বাজেটে নারীশিক্ষা খাতে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হবে। শিক্ষার সকল স্তরে নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

৬. ছাত্রীদের জন্য খণ্ডকালীন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হবে।

৭. অধিক সংখ্যক মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে এবং তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা/পেশাদারি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে এবং এ বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৮. মেয়েদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষায় এবং পেশাদারি শিক্ষায় (যেমন - প্রকৌশল, মেডিকেল আইন, ব্যবসায় ইত্যাদি) উৎসাহিত করা হবে।

৯. মেয়েরা যাতে অধিক হারে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনে মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আরও বাড়ানো হবে। প্রস্তাবিত উপজেলা কারিগরি বিদ্যালয়সমূহে মেয়েদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে।

১০. উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত/স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

১১. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণীত যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত বিধিবিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

৩.৯ বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্লগাইড এবং ব্রতচারী

৩.৯.১ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা

প্রতিবন্ধীত্বের ধরন ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হবে। তবে প্রতিবন্ধীত্বের গুরুতর মাত্রার কারণে যাদেরকে এভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হবে না তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

কৌশল

১. বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের প্রতিবন্ধীত্বের ধরন ও মাত্রাভিত্তিক বিভাজন করার জন্য শনাক্তকরণ ও জরিপ চালানো হবে।

২. প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত বিদ্যালয়সমূহে সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়।

৩. সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্কুলগুলোতে অন্তত একজন শিক্ষককে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদানের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৪. প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

৫. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। দৃষ্টি, শ্রবণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা করা হবে।

৬. প্রতিবন্ধীদের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

৭. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.৯.২ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অবহেলিত অংশ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা। শিক্ষিত জাতি গঠনে সাধারণ শিক্ষার মতো স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটোকে বাদ দিলে সাধারণ শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না।

কৌশল

১. শিক্ষার কোনো পর্যায়ে বিষয়টি পাবলিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে একটি নির্ধারিত মান অর্জন করতে হবে, যা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স ও সামর্থ্য বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যসূচিকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করা হবে।

২. শরীরচর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষা দেওয়া হবে। স্বল্পমূল্যে স্কুল কলেজে শারীরিক শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।

৩. নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সময় খেলার মাঠ থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেশীয় খেলাধুলার প্রচলন করা হবে।

৩.৯.৩ স্কাউট, গার্লগাইড ও বিএনসিসি

দেশের শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের যথাক্রমে স্কাউট ও গার্লগাইড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যোগী, সেবাপরায়ণ, স্বাস্থ্য সচেতন, সর্বোপরি আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রাখা প্রয়োজন।

কৌশল

১. দেশের সর্বত্র (স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসায়) স্কাউট ও গার্লগাইড আন্দোলন বিস্তৃত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব স্কাউটিং এবং স্কাউটিং (যদি থাকে) জোরদার করা হবে এবং না থাকলে চালু করা হবে।

২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে কাব স্কাউট, স্কাউট, গার্লগাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. এ বিষয়ের ওপর প্রতি সপ্তাহে একটি ক্লাস বরাদ্দ রাখা হবে।

৩.৯.৪ ব্রতচারী

অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের বিবেচনায় ব্রতচারী কার্যক্রম অনেকটা স্কাউটিং ও গার্লগাইডিং কার্যক্রমের অনুরূপ। তবে এটি এই দেশের সংস্কৃতির ভিতর থেকে উঠে এসেছে। এটি গীত ও নৃত্যভিত্তিক সুশৃঙ্খল একটি কার্যক্রম, যা বিদ্যালয়ে বিনোদন চর্চার বিষয় হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। ব্রতচারী কার্যক্রম সিলেট, খুলনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং জয়পুরহাটের অনেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে।

কৌশল

১. নীতিগতভাবে ব্রতচারী কার্যক্রমের স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

২. যে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটি চালু আছে তার পদ্ধতি ও কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা এবং এর একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। দেশের অন্যান্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও এটি চালু করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে।

৩. এ কার্যক্রমের জন্য সপ্তাহে দুই দিন একটি সুবিধাজনক সময়ে দিনে আধ ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা হবে।

৩.১০ অন্যান্য

৩.১০.১ ঝরে পড়া সমস্যা নিরসনে করণীয়

১. দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা হবে। পথশিশু ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনা খরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলানামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা হবে। ছেলে-মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো হবে। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে।

৪. দুপুরের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।

৫. পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া হবে।

৬. হাওর, চর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকে এমন এলাকার বিদ্যালয়ে সময়সূচি এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে. এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

৭. আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে।

৮. যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের বসতি হালকা, তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দেওয়া হবে।

৩.১০.২ গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সভ্যতার দর্পণ বলে বিবেচিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। দেশের নাগরিকদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজলভ্য করার দায়িত্ব হলো গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের। এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

কৌশল

১. দেশের প্রত্যেকটি উপজেলা সদরে এবং বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে এবং উপজেলা গ্রন্থাগারের দায়িত্ব হবে প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপযোগী বই সরবরাহ করা।

২. উপজেলাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলোকে পর্যায়ক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করা হবে। পিটিআই, নেপ এবং অধিদপ্তরসমূহের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলো আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যথাযথ কর্মসূচি নেওয়া হবে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক, সহ-গ্রন্থাগারিক সহ অন্যান্য পদ সৃষ্টি করা ও তাদের যথাযথ মর্যাদা নির্ধারণ করা হবে। গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

৪. শিক্ষা প্রশাসন

শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসনের ওপর। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, গতিশীল, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ করার জন্য বাস্তবতা ও চাহিদাভিত্তিক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.১ শিক্ষা প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের কৌশল

১. শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান ও আদেশাবলী একত্রিত করে এ শিক্ষানীতির আলোকে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২. সময়ের প্রয়োজনে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষানীতির পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য-উপাত্ত, তথ্যপ্রযুক্তি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। জাতীয় শিক্ষানীতির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়ন ও জাতীয় সংসদের কাছে উপস্থাপন করা ও সুপারিশমালা প্রদান করা এবং শিক্ষানীতির সময়োপযোগী পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সুপারিশ তৈরি করা এই কমিশনের দায়িত্ব হবে।

৩. মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ, নিয়োগকৃত শিক্ষকদের মানোন্নয়ন এবং সীমিত জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্‌রাসা ও কলেজের জন্য মেধাভিত্তিক ও উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করা হবে। এ বিষয়ে সরকারি কর্ম কমিশনের অনুরূপ একটি বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।

৪. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানসমূহ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে সক্ষম কি-না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি-না এ বিষয়ে অ্যাকাডেমিক মান নির্ণয়পূর্বক রিপোর্টের মাধ্যমে প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করা হবে। উপর্যুক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একটি প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক-এর অফিস স্থাপন করা হবে। প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক দ্বারা প্রণীত রিপোর্ট বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবে।

৫. শিক্ষা প্রশাসনে বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে দুইটি পৃথক অধিদপ্তর যথাক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা অধিদপ্তর গঠন করা হবে।

৬. শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত সকল সংস্থার জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করে তা যথাযথভাবে পালনের জন্য লোকবল ও অর্থবল যোগানোর ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৭. মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পৃথক মাদ্‌রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৮. শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরতদের উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনে উৎসাহিত করা হবে।

৯. শিক্ষা ক্যাডার পরিচালনায় আধুনিক ব্যবস্থাপনার রীতি অনুসরণ করা হবে।

৪.২ শিক্ষার স্তরভিত্তিক কতিপয় কৌশল

প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করা হবে। এতে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা হবে।

৪.২.১ প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দিয়ে কার্যকর করে তোলা হবে। নারী অভিভাবকের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি গঠন করে এবং এটিকে অধিকতর কার্যকর করে অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও এর মানোন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হবে।

৪.২.২ মাধ্যমিক শিক্ষা

১. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি জেলার অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সুসামঞ্জস্য করা হবে।

২. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে অধিকতর ক্ষমতা দিয়ে আরো জোরদার করা হবে। অভিভাবক, স্থানীয় শিক্ষা অনুরাগী, নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. অ্যাকাডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হবে, যেন প্রতিটি বিদ্যালয় প্রতি মাসে অন্তত একবার বিস্তারিতভাবে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়।

৪. অধিদপ্তরের বর্তমান (EMIS) কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ করে আধুনিকীকরণ করা হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করার জন্য এর কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে এবং তাতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হবে।

৫. স্কুল ম্যাপিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি এবং এমপিও ভুক্তির অনুমোদন প্রদান করা হবে।

৬. ব্যক্তি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় আনা প্রয়োজন। জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জনকারী উচ্চ মানসম্পন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ সরকারি সহায়তা প্রদান করা হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরি।

৭. যে সকল উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনানুসারে কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

৪.৩ শিক্ষার মানোন্নয়নে জনসম্পৃক্ততা

বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে নির্বাচিত ও পদাধিকার বলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য সম্বলিত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করার লক্ষ্যে কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সক্রিয় অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি প্রতিষ্ঠা করে অভিভাবকদের বিদ্যালয় এবং তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে আরো উৎসাহী করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৫. শিক্ষকদের দায়িত্ব, কর্তব্য, মর্যাদা ও অধিকার

শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. শিক্ষার্থীদের মনে সুকুমার বৃত্তির অনুশীলনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি, তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, সহনশীলতা, ধৈর্য, নিজ ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন; কুসংস্কারমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য।

২. শিক্ষকদের অধিকারের সঙ্গে তাদের দায়িত্বের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। শিক্ষকদেরকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পাঠদানসহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে।

৩. প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, মর্যাদা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ জরুরি। তাদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা মূল্যায়নের অব্যহত ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষকদের মর্যাদা

১. প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত অর্থে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া না হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব নয়। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের আত্মপ্রত্যয়ী, কর্মদক্ষ ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক একজন সফল অবদানকারী হিসাবে গড়ে তোলা জরুরি।

২. মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকতায় আগ্রহী এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয় গভীরভাবে বিবেচনাপূর্বক পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে, যাতে তারা যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। একই সঙ্গে শিক্ষার পরিবেশ ও মান যাতে উন্নত হয়ে সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।

৩. শিক্ষকদের কর্মদক্ষ ও সফল অবদানকারী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষকদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শিক্ষাখাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ শিক্ষকদের দেওয়া হবে।

৪. শিক্ষার সকল স্তরের জন্য উপর্যুক্ত দু'টি বিষয়ে অর্থাৎ মর্যাদা ও বেতনভাতাসহ সুযোগ-সুবিধার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা সুপারিশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতিনিধিত্ব সংবলিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে।

শিক্ষক নিয়োগ

শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। তাই শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

১. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাস এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। তবে নিচের শ্রেণীতে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেওয়া হবে।

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং যোগদানের পর সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে সি-ইন-এড (প্রাইমারি) বা বি-এড ডিগ্রি অর্জন করতে হবে।

৩. সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন প্রতি বছর যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে এবং তাদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে।

৪. মহিলা শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগসহ কোনো ক্ষেত্রেই বৈষম্য রাখা হবে না। সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৫. শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০-এ উন্নীত করা হবে।

শিক্ষক নির্বাচন

১. সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসাসমূহের জন্য মেধাভিত্তিক ও উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্ম কমিশনের অনুরূপ একটি বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন শিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

২. যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশন শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে। এই নির্বাচন উপজেলা বা জেলাভিত্তিক হবে। কমিশন দ্বারা নির্বাচিতদের মধ্য থেকে যথাযথ নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেবে।

৩. বিদ্যালয়গুলোতে প্রত্যেক বছর কত জন শিক্ষক প্রয়োজন তা উপজেলা/থানাভিত্তিক সমন্বয় করে কমিশনকে জানাবে, আর এই ভিত্তিতে এক বছরের জন্য বিষয়ওয়ারী শিক্ষক নির্বাচনের উপজেলা/থানাভিত্তিক লক্ষ্য স্থির করা হবে।

শিক্ষকদের পদোন্নতি ও অগ্রগতি

১. শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা এবং শিক্ষার সকল পর্যায়ে তাদের শিক্ষকতার মান বিবেচনায় আনা হবে। সেজন্য শিক্ষকতার মান নির্ণয় করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।

২. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক বলে উচ্চতর ডিগ্রিধারী ও প্রশিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সরাসরি নিয়োগ এবং ত্বরান্বিত পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে পদ উন্নীত (আপগ্রেডিং) করা হবে। তবে এর জন্য যথাযথ বিধি-বিধান তৈরি করা হবে।

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে বিশেষ অবদান, মৌলিক রচনা ও প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের সম্মানিত ও উৎসাহিত করা হবে।

৪. মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচিত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পদায়ন করা হবে এবং পদোন্নতির সুযোগ থাকবে।

শিক্ষকদের নৈতিক আচরণ

শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর জন্য আচরণবিধি তৈরি করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পৃথক পৃথক উপযুক্ত কমিটি গঠন করে দ্রুত আচরণবিধি তৈরির কাজ সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শিক্ষার কোনো স্তরেই শিক্ষার্থীরা যেন কোনোভাবেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মুখোমুখি না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

শিক্ষকদের নিরাপত্তা

দায়িত্ব পালনকালে পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করতে গিয়ে শিক্ষকগণকে যাতে সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতকারীদের হামলার মুখোমুখি হতে না হয় সে লক্ষ্যে তাদের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পেশাগত আচরণ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে এবং বিধিসম্মতভাবে প্রয়োগ করা হবে।

অন্যান্য কাজে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে ছুটির সময় ব্যতীত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত করা হবে না।

শিক্ষক সংগঠন

১. শিক্ষক সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড শুধু পেশাগত দাবি আদায়ের মধ্যে নিয়োজিত না রেখে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

২. শিক্ষক সংগঠনগুলোর উচিত শিক্ষকদের নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং এ নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে সরকারও একটি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষকদের ছুটি

সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অন্যান্যদের মতো অর্জিত ছুটির ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষকদের বেতন ভাতা

আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হবে। শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল যথোপযুক্ত বিন্যাস করে (যথা- সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক) তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং জাতির ভবিষ্যৎ

গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণ করা হবে। এর পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

১. সুশিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা। শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা অপ্রতুল এবং চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত ও যুগোপযোগী নয়। তাই প্রশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হবে।

২. শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন থেকে সমাজের সকল স্তরের শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দিয়ে পাঠদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য দুই মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. শিক্ষকদের কাজে যোগদানের তিন বছরের মধ্যে যথাক্রমে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন ও বিএড কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকেও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এইচএসটিটিআই-তে বর্তমানে চলমান বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ জোরদার করা হবে।

৪. শিক্ষা প্রশাসনে যোগ্য ও আত্মবিশ্বাসী কর্মকর্তা সৃষ্টির জন্য শিক্ষকদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুণাবলি জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে চাকরির মধ্য ও উচ্চস্তরে ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. শিক্ষকদের শিখন-শেখানো পদ্ধতির নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং সুবিধাবঞ্চিত ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বিশেষ শিখন চাহিদা অনুসারে শিখন কলাকৌশল, আধুনিক উপকরণ ব্যবহার ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি আধুনিকীকরণ করা হবে। প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের ও ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।

৬. প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষা কার্যক্রম সি-ইন-এড পরিবর্তন করে নতুন কার্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। এ কার্যক্রমের মেয়াদ এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ মাস করা হবে। নতুন কার্যক্রমে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের আধুনিক কলাকৌশল সংযোজন করা এবং ইন্টার্নশিপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যবহারিক পাঠদানের মেয়াদ দুই পর্যায়ে কমপক্ষে নয় মাস করা হবে।

৭. দেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান সমপর্যায়ে উন্নীত করা এবং সেগুলোতে যথাযথ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কর্মকর্তাদের সমপর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বদলির ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

৮. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকর এবং সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের স্বার্থে নিম্নমানের বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিরুৎসাহিত করে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন পূর্ণ আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৯. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন আর্থিক মজুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১০. শিক্ষকদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের জরুরি সমস্যাগুলোর সঙ্গে পরিচিত করা এবং সমস্যাদি বিশ্লেষণে দক্ষতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হবে।

১১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে। কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তা বিশেষ ব্যবস্থায় দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১২. শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, সময়ের সঙ্গে যুগোপযোগীকরণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হবে, যাতে সকল অ্যাকাডেমিক স্টাফ এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে যুযোপযোগী রাখতে পারেন।

১৩. শিক্ষকদের গবেষণা কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হবে।

শিক্ষক মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ

১. বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মূলত প্রধান শিক্ষকের ওপর। তাই প্রধান শিক্ষকগণ যাতে এই দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে পারেন সেজন্য তাঁদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

২. প্রধান শিক্ষক শিক্ষকদের বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন। প্রধান শিক্ষকের কাজের মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে জোরদার করা হবে।

৩. বিদ্যালয়ের বহিঃতত্ত্বাবধানের ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা আবশ্যক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিকভাবে নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে (যেমন- এটিপিও) বাস্তবসম্মতভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন।

সময় বিন্যাস

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের ব্রত নিয়ে শিক্ষকবৃন্দ মনোযোগ সহকারে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করবেন। অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কিত কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ জন্য শিক্ষকবৃন্দের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়।

টেবিল-১ : শিক্ষকদেরকে বিদ্যালয়ে অবস্থান করে কার্যসম্পাদন করার সময়সূচি

শিক্ষার স্তর	শ্রেণী	সময় বিন্যাস				
		সাপ্তাহিক মোট কার্যঘণ্টা	পাঠদান	শিক্ষার্থী পরিচালনা ও সংশোধন	অনুশীলনী তৈরি	অন্যান্য কাজ
প্রাক-প্রাথমিক	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী	২৪	১২	৬	৩	৩
প্রাথমিক	প্রথম থেকে পঞ্চম	৩৬	১৮	৬	৮	৪
মাধ্যমিক	ষষ্ঠ থেকে অষ্টম	৪০	২৪	৬	৬	৪
	নবম থেকে দ্বাদশ	৪০	২৪	৬	৬	৪

৬. শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে কয়েকটি প্রস্তাব

১. যে কোনো স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য সামনে রেখে শ্রম বাজারে কারিগরি দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার চাহিদা ও সরবরাহ জরিপ করাহবে এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে জরিপ অব্যাহত রাখা হবে।

২. জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিশেষ করে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের চাহিদানুযায়ী পর্যাপ্ত অর্থ ও উপকরণ বরাদ্দ ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩. দেশে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি জনবলের চাহিদা নির্ণয় করে জনশক্তি গড়ে তোলা হবে। এ সকল ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ (PPPs)-এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হতে পারে। তবে পশ্চাৎপদ ছেলেমেয়েরা যাতে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে তার সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকবে।

৪. পর্যায়ক্রমে সকল স্তরে শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষালব্ধ দক্ষতা ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন জনশক্তির চাহিদার সমন্বয় বিধানের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রণয়ন করা হবে।

৫. শিক্ষা স্তর ও ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্ত পূরণসাপেক্ষে (যেমন, প্রশাসনিক ও ভৌত কাঠামো, ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, ছাত্র বেতন ও শিক্ষক পারিশ্রমিক, অর্থায়ন, শিক্ষাক্রম, সহশিক্ষাক্রম, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি) যথাযথ

কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বছর বহিঃনিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হতে হবে এবং নিরীক্ষিত হিসাবের অনুলিপি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হবে।

৬. যেসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান চার্চ, ট্রাস্ট ও দেশি-বিদেশি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বিশেষ বিবেচনায় বরাদ্দ দেওয়া হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত হতে হবে এবং শিক্ষার স্তরভিত্তিক প্রযোজ্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। তবে বর্তমানে অধিক হারে বেতন আদায়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বেতন আদায়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করা হবে। চাঁদা আদায়ের বিষয়টিও নীতিমালার আওতায় আনা হবে।

৭. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্নমুখী বিচ্যুতি ও অসঙ্গতির কারণে শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। যথোপযুক্ত প্রতিকারের উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য ক্ষতিকর এই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও নিরুৎসাহিত করে এর অবসান ঘটানো হবে।

৮. জরিপে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্‌রাসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ও বিদ্যালয়ে সরকার কর্তৃক দেয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ সকল ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লোককে চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে, প্রয়োজনে জোরদার করা হবে।

৯. শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে দলভিত্তিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা জরুরি। এই লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।

১০. শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর জন্য আচরণবিধি তৈরি করা এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পৃথক পৃথক উপযুক্ত কমিটি গঠন করে দ্রুত আচরণবিধি তৈরির কাজ সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শিক্ষার কোনো স্তরেই শিক্ষার্থীরা যেন কোনোভাবেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মুখোমুখি না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

১১. ব্যাংক, বেসরকারি শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে উৎসাহিত করা হবে।

১২. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মচারীর (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী) সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং তাদের কাজের পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণ করা হবে। এর জন্য একটি নীতিকাঠামো তৈরি করা হবে।

১৩. কর্মচারীদের চাকরির নিয়মাবলী তৈরি করে তা বিধিবদ্ধ করা হবে এবং যারা চাকরিতে আছেন তাদেরকে তা অবগত করা হবে। আর যারা পরে কাজে যোগদান করবেন তাদেরকে নিয়োগপত্রের সঙ্গে নিয়মাবলী লিখিতভাবে জানানো হবে। তাদের বেতনকাঠামো যুগোপযোগী করা হবে।

১৪. সর্ব পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য একত্র করে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক একটি সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই তা ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এ সকল তথ্য হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS) কে এই লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি, নেটওয়ার্কিং, অর্থ ও জনবল দিয়ে আরো শক্তিশালী করা যায়। তবে কার্যকর তদারকির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাতে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি উদ্যোগেও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি উৎসাহিত করা হবে।

১৫. বাংলা ভাষার উন্নয়নে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং ব্যাপকভাবে বিদেশি ভাষার আধুনিক বই, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন শাখার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই বাংলায় অনুবাদ করার জন্য বাংলা একাডেমীকে উৎসাহিত এবং লোকবল ও অর্থবল দিয়ে সহায়তা করা হবে।

১৬. বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করার জন্য স্থাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে কার্যকর ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১৭. শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব, পর্যায়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করা হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি

১) জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী — চেয়ারম্যান

২) ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ — কো-চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ও সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৩) অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ্, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর — সদস্য

৪) অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশীদ, উপাচার্য, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর — ”

৫) অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা — ”

৬) অধ্যাপক মুহঃ জাফর ইকবাল — ”
বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

৭) অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা — ”

৮) অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা — ”

৯) অধ্যাপক ড. জারিনা রহমান খান, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা — ”

১০) অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা — ”

১১) অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, ঢাকা — ”

১২) জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত) — ”

১৩) জনাব মোঃ আবু হাফিজ, অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত) — ”

১৪) মাওলানা অধ্যাপক এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান — ”
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসা ঢাকা ও সিলেট

১৫) বেগম নিহাদ কবির, ব্যারিস্টার, সিনিয়র পার্টনার, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটস — ”

১৬) অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী, সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি — ”

১৭) অধ্যাপক শাহীন মাহ্‌বুবা কবীর, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা — ”

১৮) অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির — সদস্য-সচিব
পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ঢাকা।

সহযোগিতায়
সিভিল সোসাইটি এডুকেশন ফান্ড (সিএসইএফ)